দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ॥ মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক কৃষি শিক্ষা

সাজ্জাদ হোসেন

১৯৯৬ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃষি শিক্ষাকে কেন আবশ্যিক বিষয় করা হলো তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে— "... মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪টি শিক্ষাবোর্ড হতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩ লাখ (অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর প্রায় ৫০%) ছাত্র/ছাত্রী অকৃতকার্য হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। তারা নিজের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কোন রকম উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। ফলে মানব সম্পদের এক বিরাট অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। এই সকল অর্ধশিক্ষিত বেকার অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এই সকল বেকারকে কৃষি কাজে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই বিষয়ের পাঠ্যসূচী এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাত্র/ছাত্রীরা ফসল চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ এবং বনায়ন করে স্বকর্ম সংস্থান করতে পারে। এজন্য পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকে তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা রয়েছে।" (দ্রষ্টব্য "ভূমিকা" কৃষি শিক্ষা, নবম ও দশম শ্রেণী)।

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বিষয়ে মোট ১০০ নম্বর রয়েছে, তত্ত্বীয় ৬০ এবং ব্যবহারিক বিষয়ে ৪০ নম্বর। তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষায় প্রায় সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান ফলিত বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস ছাড়া এ বিষয়ে কখনই পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

কৃষি শিক্ষা পাঠ্যসূচীকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (১) কৃষি ও ফসল, (২) হাঁস-মুরগি পালন, (৩) পশুপালন, (৪) মাছ চাষ ও (৫) বনায়ন। প্রতিটি ভাগেই ব্যবহারিক অংশ রয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম এবং কৃষি খামার। রাজধানী ঢাকার কথাই ধরা যাক। এখানে কয়েক শ' স্কুল রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে শত শত শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এই স্কুলসমূহে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার জন্য কোন জমি বা খামার আছে বলে জানা যায়নি। ফলে কৃষি শিক্ষা বিষয়টি সত্যি একটি নির্ভেজাল তত্ত্বীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যার কারণে কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। কৃষি শিক্ষা বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ব্যবহারিক অংশটির কথাই ধরা যাক। বিষয় ১ঃ ধানের পোকা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, ধানের পোকা সংগ্রহের জন্য ধানক্ষেতে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। অথচ বেশির ভাগ স্কুলেই এ সুযোগ নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা বাজারের সুন্দর রঙিন ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা বই থেকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেবে একথা বলাই বাহুল্য। যেখানে দেশের কৃষি কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত উপকরণ নেই, সেখানে স্কুলে এ ধরনের সুযোগ আশাও করা যায় না। সুতরাং গোড়ায় গলদ থেকেই গেছে।

কৃষি শিক্ষা বইয়ের ভূমিকায় স্বীকার করা হয়েছে যে, মোট পরীক্ষার্থীর ৫০% ফেল করে। যে সব শিক্ষার্থী ফেল করে তারা অবশ্যই পাঠ্যসূচী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করে না। সুতরাং এই সকল ফেল করা শিক্ষার্থী কিভাবে কৃষি শিক্ষা অধ্যয়ন করে স্বকর্ম সংস্থান করতে পারবে?

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার দেশে কৃষিকে আবশ্যিক বিষয় করার আগে আরও ব্যাপক চিন্তাভাবনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে জনমত যাচাই করারও অবকাশ আছে।